বাংলায় বাম আন্দোলনের বিতর্কিত অধ্যায়

লাল রাজনীতি

সরদার আবদুর রহমান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রাক-কথন

বিংশ শতাব্দীর পুরোটা সময়জুড়ে বিশ্বের একটা বিপুল অংশের জনগোষ্ঠীকে প্রায় মোহাচ্ছন্ন করে রাখে যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক মতাদর্শ, তার সাধারণ নাম 'সমাজতন্ত্র'। তবে এটি কমিউনিজম ও সোশ্যালিজম নামেও পরিচিত। একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী এটি 'বামপন্থা' নামে পরিচিতি পায়। এর কিছুটা ধাক্কা লাগে ভারতে এবং সেইসঙ্গে বাংলা ভূখণ্ডে। এই মতাদর্শের রূপ-স্বরূপ যেমন বিপুল বিতর্ক তৈরি করে, তেমনই এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়েও মতভেদের শেষ ছিল না। এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, সমাজতন্ত্র তথা বামপন্থা তার যৌবনের সময়গুলোতে বিপুলসংখ্যক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমনকি এই মতবাদের ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক রাষ্ট্রও পরিচালিত হয়। বাংলা অঞ্চলের এই মতবাদের অনুসারীদের একটি অংশ যে গণতান্ত্রিক বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে কর্মতৎপরতা চালাতে আগ্রহী ছিল সেটা সত্য, তবে মূলধারার বামপন্থিরা প্রধানত সশস্ত্র সন্ত্রাসের পথেই তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে মনোযোগী ছিল।

ইতিহাসের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এ দেশে সশস্ত্র পথ ও পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করে স্বদেশিরা এবং এরই ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার কৌশল প্রবর্তন করে বামপন্থিরা। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু এই মতবাদ বা তন্ত্রের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়েই আবর্তিত হয়েছে। আর এই প্রক্রিয়া হলো 'সশস্ত্র' পন্থা। অর্থাৎ, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অস্ত্রের জোরে এর জন্য পথ করে দেওয়া। ফলে চলতি সময়ে যাকে জঙ্গি, চরমপন্থি, উগ্রবাদী, সন্ত্রাসবাদী প্রভৃতি নেতিবাচক শব্দ দিয়ে উল্লেখ করা হয়ে থাকে—এসবই এই সশস্ত্রপন্থার শামিল।

বাংলা-ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা উৎখাতের জন্য একটি অংশ স্বদেশি নামে যে জঙ্গি ও সশস্ত্র পথ অবলম্বন করে, তারই ধারাবাহিকতায় এবং প্রক্রিয়া-পদ্ধতিসমূহ ধারণ করেই বামপন্থার বাস্তবায়নেও অগ্রসর হতে দেখা যায় এর নীতিনির্ধারক ও কর্মীদের। ফলে রাইফেল-বন্দুক, পিস্তল-রিভলবার, গুলি-বোমা, ছুরি-চাকু প্রভৃতি হয়ে ওঠে অসংখ্য মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যনির্ধারক। ব্রিটিশ আমলে যে সশস্ত্র কর্মতৎপরতা স্বরাজপন্থিদের মাধ্যমে পরিচালিত হতো, সেটিই বাংলাদেশে বামপন্থিদের একটি অংশের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ও উৎসাহী দল বা গোষ্ঠীগুলো বহুধা বিভক্ত হলেও এর মূল সূত্র ও চেতনা একই—একটি শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; যদিও এর সম্ভাব্যতা নিয়ে হতাশাও বিদ্যমান। বহু গ্রুপ ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত নেতা-কর্মী-সমর্থকরা এর আদর্শিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পাশাপাশি প্রক্রিয়া-কৌশল নিয়ে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে থেকে লড়াই চালিয়ে গেছে। বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলে এই অবস্থান এতটাই তীব্র হয়ে পড়ে যে, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মঘাত তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন করে ফেলেছে।

এই সশস্ত্র তৎপরতা চালানোর পেছনের চালিকাশক্তি হিসেবে ইতিহাসে যাদের নাম চিহ্নিত হয়ে এসেছে, তারা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক আপস ও ভাগাভাগির মাধ্যমে নিরাপদ থাকতে পেরেছেন। তবে এর নির্মম বলি হয়েছে কেবল মাঠের কর্মীরা। এর বেশির ভাগ নেতৃত্ব শুধু টিকেই যাননি,

রীতিমতো পুরস্কৃত হয়েছেন। রাজনীতির পথরেখাও তারা নির্ধারণ করে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। বামপন্থা নিয়ে যে বিপুল গ্রন্থ ও সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাতে এসব নেতিবাচক কর্মকাণ্ডকে 'মহান' এবং 'বীরত্বগাথা' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। হত্যা-রাহাজানি, খুনোখুনি, বোমাবাজি-বন্দুকবাজিকে নিন্দা করা হয়েছে খুবই কম।

কিছু বাম বুদ্ধিজীবী ও লেখকের রচনায় সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ ও নষ্ট রাজনীতি মেরামতের উপদেশ ও পরামর্শমূলক বাণী প্রচার করতে দেখা যায়। দেখে মনে হয়, অন্য কোনো গ্রহ থেকে কেউ এসে এই সন্ত্রাসী ও নষ্ট কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেছে। এসব যে মূলত বাম-রাজনীতিরই অবদান, সে কথা তারা ভুলিয়ে দিতে চান। সশস্ত্রপন্থার সমর্থক বামপন্থিদের অনেকেই এই লাইনে ব্যর্থ হয়ে এর সমালোচনা শুরু করেন এবং এর সংশোধনের পক্ষে বক্তব্য দিতে থাকেন।

এই গ্রন্থে বামপন্থার সফলতা-বিফলতা বিচার কিংবা এ বিষয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা করার কোনো লক্ষ্য ছিল না। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ, উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ গত দুই দশকজুড়ে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও বিশেষভাবে আলোচিত। তবে এর সঙ্গে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের বিষয়ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই এই জঙ্গি ও উগ্রপন্থার অতীত সন্ধান করার বিষয়টি মাথায় আসে। তাতে যে ভয়াবহ চিত্র উঠে আসে, সেগুলো একত্রিত করে পরিবেশন করাই এই গ্রন্থের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। গ্রন্থের পরিধি নয়, সুসংবদ্ধ তথ্যই এর মূল প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে। বিশেষ ব্যক্তি বা দলের কর্মকাণ্ড নয়; বামপন্থার মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় যে বা যারা এই নেতিবাচক কর্মতৎপরতা চালিয়েছে, অনিবার্যভাবে তাদের প্রসঙ্গই এখানে উঠে এসেছে।

বামপন্থাবিষয়ক গ্রন্থাদি দুই বাংলায় খুবই অপ্রতুল। তবে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে একাধিক বাম রাজনৈতিক মহলের কর্মকাণ্ড বিচার করতে গিয়ে কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এগুলো প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বিশেষভাবে সহায়ক। এইসব গ্রন্থের উদ্ধৃতি ও তথ্যকে 'লাল রাজনীতি—বাংলায় বাম আন্দোলনের বিতর্কিত অধ্যায়' শিরোনামে গ্রন্থে গুরুত্বের সাথে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পরিশিষ্টে কয়েকটি সহায়ক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

এই গ্রন্থ রচনায় যাদের সহযোগিতা মিলেছে, তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। এর মধ্যে কবি ও গবেষক ড. ফজলুল হক তুহিন, গল্পকার দেওয়ান মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, কবি ও গবেষক এডভোকেট খুরশীদ আলম বাবু প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে হয়। এছাড়া প্রত্যেকের প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা। বইটি প্রকাশে এগিয়ে আসায় ঢাকার অভিজাত প্রকাশনী গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে ধন্যবাদ জানাই। বইটি পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

সরদার আবদুর রহমান
জানুয়ারি, ২০২৩

ভূমিকা

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের রুশ বা বলশেভিক বিপ্লব ছিল মূলত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের মূল স্লোগানসমূহ ছিল—'শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াই', 'ধনিকশ্রেণির বিরুদ্ধে সর্বহারার লড়াই', 'পুঁজিপতির বিরুদ্ধে পুঁজিহীনের লড়াই' প্রভৃতি। এই বিপ্লব সমাজতন্ত্রকে একটি মতাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পুরো পৃথিবীতে পরবর্তী প্রায় শতবর্ষব্যাপী একটা আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি টিকে থাকতে পারেনি। কারণ, সমাজতন্ত্রের মূল চেতনা যেমন বহুবিধ মতভেদের কারণে বিভক্তির শিকার হয়, তেমনই এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিয়ে মতভেদও অনুসারীদেরকে খণ্ডবিখণ্ড করে দেয়। ফলে প্রায় সারা পৃথিবীতে এটি তার গৌরব হারিয়ে ফেলে।

গবেষণাসূত্রে দেখা যায়, বাম রাজনীতির স্রষ্টা হচ্ছেন দুই জার্মান মনীষী কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। তাদের চিন্তাধারা সাধারণভাবে মার্কসবাদ নামে এবং মার্কসবাদের অনুসারীগণ কমিউনিস্ট নামে পরিচিত। নানা পরিচয় ও অবয়বে উপমহাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় থেকে কমিউনিস্টগণ যে রাজনৈতিক ধারার জন্ম দিয়েছেন, তা বাম রাজনীতি নামে পরিচিত। অর্থাৎ, সাধারণ অর্থে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নীতিতে বিশ্বাসীদের বামপন্থি বলা হয়। তবে কমিউনিস্টদের এক বিরাট অংশ পরবর্তীকালে মাও সেতুং-এর চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে অনুসরণ করেছে। গণতন্ত্রের অনুসারীগণ যেমন গণতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রের অনুসারীগণ যেমন সমাজতন্ত্রী নামে পরিচিত, বামপন্থিদের বোঝাতে তেমন সুনির্দিষ্ট কোনো অভিধা নেই। তবে এ কথা সত্য যে, বামপন্থি শব্দটি রাজনৈতিক অবস্থানজ্ঞাপক শব্দ।

এই মতাদর্শ আজ মোটাদাগে 'বামপন্থা' ও 'বামপন্থি' অভিধায় পরিচিত। বলতে দ্বিধা নেই, এই মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রচার হয়তো গরিবের কল্যাণচিন্তা করেই অগ্রসর হয়েছিল। কালের আবর্তনে রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর কিছু প্রভাব প্রতিষ্ঠাও পেয়েছে। তবে 'প্রগতিশীলতা'র আবরণে সমকালে এর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের ভেতরে তার প্রভাব বিদ্যমান। মানুষের সাধারণ কিছু আবেগ, চিন্তাচেতনা ও মূল্যবোধের দিকগুলোকে অস্বীকার করে এটি এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। ফলত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে এটি ব্যর্থ হয়। তবে পৃথিবীর কিছু কিছু অংশে যে এটি এখনও কিছুসংখ্যক মানুষের মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এ কথা অস্বীকার করার জো নেই।

ভারত উপমহাদেশে বাম মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব ফেলে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতে ব্রিটিশ-তোষণ বনাম ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব, মস্কো বনাম পিকিং মনস্তাত্ত্বিক লড়াই ও বিভাজন, স্বাধীনতার জন্য পরপর দুটি সংগ্রাম প্রভৃতি। এসব ঘটনা বাম আন্দোলনের মোড় বদলে সাহায্য করে। এই মোড় বদল কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংগঠনগুলোকে পরস্পরবিরোধী অবস্থান গ্রহণের দিকে ঠেলে দেয়। এসব টানাপোড়েনের মধ্যেই এই বামপন্থি আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতির চেয়ে গোপন ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি ঝুঁকে পড়তে দেখা যায়। শুরুর দিকে ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের ধারা গ্রহণ করে 'স্বদেশি' নামক আন্দোলন। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতি লুফে নিয়ে এর সঙ্গে একাকার হয়ে যায় বামপন্থি সংগঠনগুলো। যদিও

স্বদেশিদের ভাবধারা ছিল ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক, কিন্তু বামপন্থিরা এই স্বদেশি আন্দোলনকর্মীদেরই নিজেদের হিরো হিসেবে বরণ করে নেয়। তাদের কর্মতৎপরতাকে 'বিপ্লবী' আখ্যা দিয়ে স্বদেশি নির্যাস আত্মস্থ করতে থাকে। এক পর্যায়ে এটি 'লাল রাজনীতি' থেকে 'লাল সন্ত্রাস' এবং 'বাম রাজনীতি' থেকে 'বাম সন্ত্রাস' নামে পরিচিত হতে থাকে।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুন ঢাকায় বিরোধীদের দ্বারা কমিউনিস্ট পার্টির এক জনসভা পণ্ড হওয়ার অজুহাতে পার্টি প্রকাশ্য রাজনীতির পথ পরিহার করে। এরপর গোপনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত রনদীভের নীতি অনুযায়ী শুরু করে সশস্ত্র সংগ্রাম। মনি সিংহের নেতৃত্বে ময়মনসিংহের দুর্গাপুর অঞ্চলে টংক-বিরোধী আন্দোলন, ইলা মিত্রের নেতৃত্বে রাজশাহীর নাচোল অঞ্চলে, সুব্রত পালের নেতৃত্বে সিলেটের সানেশ্বর এলাকার কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এ ছাড়াও যশোর ও খুলনা জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে কৃষকদের জোতদারবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালিত হয় কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে। ময়মনসিংহের টংক আন্দোলন এবং নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ ছিল অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও অধিক সংগঠিত। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, এসব কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত করা হয় মূলত উপজাতি ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ব্যবহার করে। মুসলমান কৃষকদের মধ্যে এসব বিদ্রোহ তেমন কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি; বরং মুসলমানরা কমিউনিস্টদের 'দেশদ্রোহী' এবং 'নাস্তিক' ভেবে শত্রু জ্ঞান করত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বছরের মধ্যে ভারতীয় পার্টির অনুকরণে কমিউনিস্টদের সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার এ নীতি গ্রহণ ছিল প্রকৃতপক্ষে হঠকারিতার নামান্তর। ফলে কমিউনিস্টরা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে হয়ে উঠেছিল অগ্রহণযোগ্য।

এই ধারায় প্রবেশের জন্য 'রণদীভের তত্ত্ব' কাজে লাগানো হয় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এর প্রথম প্রয়োগ ঘটায় কমিউনিস্ট পার্টি। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল নামক জনপদে তাদের একটি আক্রমণেই চাকরিরত চারজন পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পঞ্চাশ দশকের সদ্য স্বাধীন একটি দেশে এই ঘটনাকে সহজভাবে গ্রহণ করা হয়নি। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি আরও কিছু সশস্ত্র ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটায়। তাদের পরিচালিত আন্দোলনসমূহ প্রধানত সশস্ত্র ধারায় পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে তারা এই ধারা পরিত্যাগ করে এবং প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাঁধে সওয়ার হয়ে নিজেদের লক্ষ্য হাসিলে সচেষ্ট হয়। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে পুলিশ হত্যাসহ এ রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রথম প্রবর্তনকারী হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির নাম ইতিহাসে লেখা হয়ে গেছে।

তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে যতগুলো বাম মনোভাবাপন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছে, এর সবগুলোর পেছনেই কোনো না কোনোভাবে কমিউনিস্টদের হাত কাজ করেছে। ফলে বাম মতবাদ প্রতিষ্ঠায় যত প্রাণ অযথাই এবং অকালে ঝরেছে, তার দায় কমিউনিস্ট পার্টিকে যে বহন করতে হবে—এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই। অন্য ধারার বামপন্থি দলের বড়ো অংশ প্রকাশ্য ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বদলে গোপন ও সশস্ত্র পন্থাকেই অব্যাহত রাখে। ক্ষমতা দখলের জন্য তারা শ্রেণিশত্রু খতম, গলা কাটার রাজনীতি, জমি ও গোলার ফসল লুট, পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিদের হত্যা, থানা ও ফাঁড়িতে হামলা করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট, ঘরে বসে বোমা বানানো, ব্যাংক ও ট্রেজারি লুট, দূতাবাসে আক্রমণ, সেনানিবাস ও সেনাক্যাম্পে অফিসারদের ধরে ধরে হত্যা করা

প্রভৃতি সকল প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের রোমহর্ষক নজির স্থাপন করে। সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়েই এ সকল তৎপরতা পরিচালিত হয়, যার হাজার হাজার উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় রক্ষিত আছে।

ব্রিটিশ তাড়ানোর সশস্ত্র আন্দোলন হোক অথবা পাকিস্তানের শাসনকালে পুলিশ মারার আন্দোলন—এগুলোকে জনগণের মুক্তির আন্দোলন বলে একটা কৈফিয়ত দেওয়ার সুযোগ আছে। এসব আন্দোলনে হতাহতদের শহিদ কিংবা গাজি অথবা মহান সৈনিক, জাতীয় বীর ইত্যাদি উপাধিও দেওয়া যেতে পারে। তবে সাধারণ মানুষ এসব তকমা কখনোই গ্রহণ করেনি। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ছাড়া সশস্ত্র পথ-পদ্ধতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হয় না। পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামেও বামপন্থিরা ঐকমত্য প্রকাশ করার বদলে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। তাদের একটি অংশ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়, একটি অংশ একইসঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং অপর একটি অংশ সরাসরি পাক বাহিনীকে সহযোগিতা করে। এটিও ইতিহাসের এক নিরেট সত্য।

দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় পর ‘গলা কাটা রাজনীতি’র অনুসারী অনেকের ভেতরেই অনুশোচনার সৃষ্টি হয় এবং এ বিষয়ে বহু আলোচনা-পর্যালোচনার পালা অতিক্রান্ত হয়। কিন্তু তাতে কোনো সমাধান হয়নি। এই দীর্ঘ অরাজকতার আবহে রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছিল, তার মেরামত আজও সম্ভব হয়নি। এসবের দায়ও কেউ স্বীকার করেনি; বরং সেই সময়ের সৈনিকদের মহান বিপ্লবী অভিধায় আখ্যায়িত করার প্রবণতা এখনও বিদ্যমান। বামমহল থেকে হয়ত বলা হবে, নষ্ট রাজনীতি ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার বিপরীতে এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিকল্প ছিল না। সেক্ষেত্রে যে কেউ এই আদলে কার্যক্রম চালিয়ে একই কৈফিয়ত দিলে তাদেরও তো দোষ দেওয়ার উপায় থাকে না।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট ও বামপন্থিদের একটা ভূমিকা আছে। একে খাটো করে দেখারও অবকাশ নেই। তবে বামপন্থিদের বিষয়ে তাদের নিজেদেরই মূল্যায়ন এ রকম যে, কমিউনিস্ট ও বামপন্থিরা বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ থেকে দূরে থেকেছেন। কথাটির ব্যাপক অর্থ এই—তারা এ দেশের ইতিহাস, সমাজ-সংস্কৃতি অনুধাবন করার চেষ্টা করেননি কখনো। জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় অর্থনীতি, জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ে তারা কখনো ভাবেননি। যে সমাজকে বদলাব তাকে জানব না, এটা তো হতে পারে না। অথচ যুগের পর যুগ তারা সেই পথেই হেঁটেছেন। ক্রমাগত বিভক্ত হয়েছেন, সংকীর্ণতায় ভুগেছেন আর বর্তমানে বুর্জোয়াদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছেন। মোটকথা, তারা বহুলাংশেই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই অবস্থা থেকে সহসাই তারা নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে পারবেন—এমনটাও মনে হয় না।

বামপন্থি ঘরানায় কিছু নিজস্ব পরিভাষা চালু আছে, যেগুলো সম্পর্কে খুব সীমিতসংখ্যক মানুষই ধারণা রাখে। তারা এসবের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাও জানে না। ফলে এত বছরেও সাধারণ মানুষের কাছে এগুলোর কোনো আবেদনও সৃষ্টি হয়নি। কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি বলে পরিচিত যেসব মানুষের পক্ষে দাবি বা স্লোগান উচ্চারিত হয়, সেগুলো নিছক কিছু সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা আর বড়োজোর মালিকের পকেট ফেঁড়ে কিছু আদায় করে নেওয়ার মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে বাম সংগঠকদের একটা কৃতিত্ব হলো—এই আন্দোলনে তারা তারুণ্যকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। বহু

মেধাবী তরুণ এতে শামিল হয়েছিল। এখনও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষদের নিজেদের মেধাবী বলে তৃপ্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু যে তত্ত্ব সাধারণ মানুষের হয়ে উঠতে পারে না; যে মতবাদের অনুসারীরা ঘৃণা, বর্ণবাদী মনোভাব এবং অস্পৃশ্যতার ছুৎমার্গ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না, তাদের কর্মকাণ্ড বৃহত্তর পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা পাবে—সে আশার গুড়ে বালি।

কোনো কোনো বামপন্থি রাজনীতিবিদও স্বীকার করেন—'অহংকার' বামপন্থি সুনামের ক্ষতি করেছে এবং বামপন্থি রাজনীতিবিদদের জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশেও বহু বামপন্থিদের নাস্তিক পরিচিতি রয়েছে, যার দরুন তাদের পক্ষে তৃণমূল স্তরে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এবং একটি স্থিতিশীল নির্বাচনি এলাকা তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া প্রায়শই আপাত বামপন্থিদের মধ্যে স্থান করে নেয় সুবিধাবাদ। এর ফলে বামপন্থি নেতারাও ক্ষমতার টোপ গিলে ফেলেন অবলীলাক্রমে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের সার্বিক বামপন্থি আন্দোলন। এ সমস্ত কারণে আজ থেকে প্রায় শতাব্দীকাল আগে চর্চা শুরু হলেও এতদঞ্চলে বামপন্থি রাজনীতির অন্তর্নিহিত সংকট কমেনি; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা গাঢ় হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ষাটের দশকে এসে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়। একপর্যায়ে দলীয় কোন্দল ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভেদ এ দেশের আন্দোলনেও ছেদ সৃষ্টি করে, যার প্রভাব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে ১৯৬৬ সালের শেষ দিকে। এরপর কমিউনিস্ট পার্টি খণ্ডবিখণ্ডিত হয়েছে বছরের পর বছর ধরে। অবশ্য আশির দশকে ঐক্য আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয়। তবে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন কমিউনিস্ট আন্দোলনে চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটায়।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বামপন্থার আদর্শিক ও রাজনৈতিক পরিচয় ২০
বাম-সংশ্লিষ্ট শব্দ ও পরিভাষা ২৩
সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থা সম্পর্কে ২৮
উপমহাদেশে লাল রাজনীতির উত্থান ৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বরাজ এবং বাম সন্ত্রাস ৩৮
পূর্ববঙ্গে সন্ত্রাসের বিস্তার ৪৮
স্বদেশি থেকে বামে মোড় ৫৯

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলায় সেভিয়েতপন্থি কমিউনিস্টদের সন্ত্রাস ৭০
রণদীভ লাইনের সম্প্রসারণ ৭৫
কমিউনিস্টদের সশস্ত্র বাহিনী ৮০

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশ পর্বে বামপন্থি ধারা ৯৩
বাংলাদেশে তৎপরতা ১০০
শ্রেণিসংগ্রাম ও গেরিলা যুদ্ধ ১০৪
অন্তকোন্দল ও হানাহানি ১১০

পঞ্চম অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও গণবাহিনীর উত্থান ১২৫
গণবাহিনীর সন্ত্রাস ১৩০
পারস্পরিক সংঘাতের বলি ১৪৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাম হঠকারিতার পর্যালোচনা ১৪৯
বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গন ১৫৬
উপসংহার ১৫৯

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোল সম্পর্কে একটি ১৬৩
বিদ্রোহ ১৬৮
বাংলাদেশের বাম রাজনৈতিক দলের পরিচয় ১৭২
বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির তালিকা ১৭৮
গ্রন্থ ও তথ্যপঞ্জি ১৮০

প্রথম অধ্যায়

বামপন্থার আদর্শিক ও রাজনৈতিক পরিচয়

বামপন্থি শব্দটি আধুনিক কালের সচেতন মানুষদের নিকট বহুল পরিচিত। সাধারণভাবে সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমে বিশ্বাসী ও অনুশীলনকারীদের ‘বামপন্থি’ অভিধায় উল্লেখ করা হয়ে থাকে। একে ‘সাম্যবাদ’ হিসেবেও পরিচিত করানো হয়ে থাকে। বাংলায় ‘লাল রাজনীতি’ বলতে বামপন্থি নীতি, আদর্শ ও রাজনীতির লালনকারীদের দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডকেই বোঝানো হয়েছে। এই অধ্যায়ে ‘বাম’ শব্দের উৎপত্তি, সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদের পরিচয়, ভারতে বামপন্থার আগমন এবং লাল রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

‘বাম’ শব্দের উৎপত্তি

১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের সময় বিশেষ অর্থে ইংরেজি left শব্দের উৎপত্তি হয়। তখন পার্লামেন্টের ডান দিকে বসত শাসকদল এবং সভাপতির বাম পাশের আসনগুলোয় বসত বিরোধী দল। বাম দিকে বসার জন্য তাদের বলা হতো বামপন্থি বা লেফটিস্ট। পরবর্তীকালে ফ্রান্সের অনুকরণে অন্যান্য দেশের আইনসভাতেও বিরোধী দলের বাম দিকে বসার রীতি চালু হয়।[১২] কালের ধারাক্রমে সমাজতন্ত্রীদেরই এখন সাধারণভাবে বামপন্থি বলা হয়। মহিউদ্দিন আহমদ বাম রাজনীতির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

> ‘বিদ্যমান রাজনৈতিক পদ্ধতি ও শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মতাদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত এটি একটি রাজনৈতিক উদ্যোগ। সাধারণভাবে এ উদ্যোগটি হলো প্রয়োজনে চরমপন্থা অবলম্বন করে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। টমাস পেইন (১৭৩২-১৮০৯), ভলটেয়ার (১৬৪১-১৭৭৮), বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩৪), কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) প্রমুখ চিন্তাবিদ আধুনিক বাম ভাবাদর্শিক রাজনীতির প্রবক্তা।’[৩]

কমিউনিজম-এর পরিচয়

গবেষক মুর্শিদা বিনতে রহমান ‘কমিউনিজম’-এর পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন—

> ‘মানবসভ্যতার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার একটি আদর্শগত রূপ হলো কমিউনিজম। রাষ্ট্রহীন, শ্রেণিহীন, অনাড়ম্বর সর্বোপরি উৎপাদনের ওপর সর্বজনীন মালিকানা প্রতিষ্ঠা হলো কমিউনিস্ট সমাজের মূলভিত্তি। কমিউনিজম Communism শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ Commuin থেকে; যার অর্থ ভাগ বা সাধারণ। ইংরেজি

---

[১] হারুনুর রশিদ : *রাজনীতিকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ২৬৯।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯।

[৩] মহিউদ্দিন আহমদ : *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-৭), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৯।

কমিউনিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৮৪১ সালে এবং সাম্যবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয় ১৮৪৩ সালে। কমিউনিজম-এর ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থ আছে। ব্যাপকার্থে তা বোঝায় গঠনকে আর সংকীর্ণার্থে গঠনের উচ্চতর পর্যায়কে। এ ধারণা দিয়ে মূলত একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে বোঝানো হয়, যার বিকাশের দুটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে। সমাজতন্ত্র হলো এই গঠনের নিম্নতম পর্যায় আর কমিউনিজম হলো উচ্চতর। একটি আদর্শিক উদ্যোগ হিসেবে কমিউনিজম উনিশ ও বিশ শতকে বিভিন্ন মহলকে আকৃষ্ট করে।'[৪]

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

সমাজতন্ত্রের সাধারণ ধারণা ছাড়াও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীগণ মনে করেন—

১. কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন : জমি, জল, জঙ্গল প্রভৃতি সৃষ্টি করেনি। সুতরাং সেগুলোর ওপর কোনো ব্যক্তির মালিকানা থাকা উচিত নয়। তাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলে—এইসব প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর সকলের সমান অধিকার রয়েছে।

২. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীগণ সকলের কাজের অধিকার দাবি করে। তারা মনে করে, বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।

৩. পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় অল্পসংখ্যক মানুষের কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ জমা হয়, ফলে শ্রমিক শ্রেণি থাকে নিঃস্ব ও রিক্ত। তাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা বলেন, সম্পদের বণ্টনে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির বৈষম্যের অবসান ঘটবে।

৪. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হলো—উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্থাপন করা। এর ফলে পুঁজিবাদ ও উৎপাদন নিয়ে প্রতিযোগিতা ও শোষণের অবসান ঘটবে।

৫. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীবাদীরা শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন। এরূপ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার নেতৃত্ব দেবে সর্বহারা শ্রমিকগোষ্ঠী। এভাবে রাষ্ট্রে সর্বহারার একনায়কত্ব স্থাপন হবে।[৫]

---

[৪] মুর্শিদা বিনতে রহমান : বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা (১৯৬৬-১৯৯১), পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ২০১৫-১৬, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[৫] www.a2notespoint.com/2022/08/class-nine-history-chapter-4-question-and-answers-in-bengali.html